International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর লোকাচার

সেখ জহুরুল হোসেন
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
ইন্দাস মহাবিদ্যালয়

সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির ছাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আবার এটাই স্বাভাবিক যে প্রচীন সাহিত্যেরই বিশেষ কোন বর্ণনীয় বিষয় পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতিতে আত্মভূত হয়ে পড়েছে। 'মিথ' হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিষয়। নাটকের সমাজ ও তার লোকাচার বাস্তবের থেকে পৃথক হতে পারে কিন্তু কবি যেহেতু বিশেষ সমাজে উৎপন্ন এবং তার শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বর্ধিত, তাই তার নিজের কিছু সংস্কার ও লোকাচার নাটকে ছাপ রেখে যায়। মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'র মত শ্রেষ্ঠ নাটকে এইরূপ বেশকিছু সংস্কার, লোকাচার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরূপ সংস্কারের মূলে থাকে লোকবিশ্বাস যার যৌক্তিকতার ভূমি সর্বদা সুদৃঢ় নয়।

রাজা দুষ্যন্ত রঙ্গমঞ্চে এলেন কৃষ্ণসার হরিণটি তাড়া করতে করতে। কণ্বাশ্রমের তপস্বী বৈখানস হাত তুলে রাজাকে বারণ করলেন এটি আশ্রমের মৃগ, একে মারবেন না, মারবেন না—''রাজন্ আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।''[১] তৎক্ষণাৎ রাজা দুষ্যন্ত বাণ সংরবরণ করলেন—''এষঃ প্রতিসংহৃতঃ।''[২] হরিণটিকে তীরবিদ্ধ না করায় বৈখানস রাজা দুষ্যন্তকে আশীর্বাদ করলেন—'আপনি রাজ চক্রবর্তীযুক্ত পুত্র লাভ করুন'।

''জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবংগুর্ণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি''।[৩]

এরকম আশীর্বাদ হবার কথা নয়, 'দীর্ঘায়ু হোন'—এই আশীর্বাদই বিবক্ষিত ছিল। এরকম আশীর্বাদ তখনই হয় যখন রূপকথার গল্পের পটভূমি থাকে। রূপকথার গল্পটি হয়তো এমন ছিল—কোন এক রাজা ছিল, তার অনেক রাণী, ক্ষেতভরা ধান্যাদি শস্য, রাজ কোষাগার মোহর, জহর, হীরে, সোনা, রুপাতে ঠাসাঠাসি। তবুও যেন রাজার মনে সুখ নেই। কেননা; তাঁর কোন পুত্র নেই। অবশেষে রাজা এলেন তপোবন আশ্রমে। এখানে ঋষি রাজাকে আশীর্বাদ করলেন—'তোমার পুত্র হবে' ইত্যাদি।

অতএব, আমরা খুব সহজেই দুষ্যন্তের আশীর্বাদ প্রাপ্তির পটভূমিতে

লোকবিশ্বাসকে, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত লোক-প্রচলিত গল্পকে দেখতে পারি। এই স্থলে ঋষিরা রাজা দুষ্যন্তকে দীর্ঘায়ু হোন, যশস্বী হোন—এসব না বলে হঠাৎই পুত্র প্রাপ্তীর আশীর্বাদ করলেন কেন? এমনটাও তো হতে পারতো রাজার আট-দশটি পুত্র সন্তান ঘর আলো করে আছে—এক্ষেত্রে ঐ আশীর্বাদ গুরুত্বহীন হয়ে পড়তো, এমতাবস্থায় আমাদের ধরে নিতে হবে যে রাজা অপুত্রক ছিলেন এবং তার এই মানসিক কষ্টের কথাটা রাজ্যের সকল মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হত। সুতরাং রূপকথার সঙ্গে তা পুরো মিলে যায়।

কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার সাথে রাজা দুষ্যন্তের দেখা হল। দেখা মাত্রই ভালোবাসা—জদ্রদ্রত্র থষ্ঠহুস্ঠহ্রে অতঃপর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহায়তায় শকুন্তলার রাজার প্রতি 'কাম আমায় পোড়াচ্ছে'—

"তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি।
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়ঃ ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি"।[৪]

এই ধরণের প্রেমপত্র পাঠানো—এসব যেন রূপকথার পক্ষিরাজের গতিতে দ্রুত এগোচ্ছে। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বিয়ের আগেই রাজা দুষ্যন্তকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছেন যে, তাদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে প্রধানা মহীয়সী করতে হবে এবং তার পুত্রকেই পরবর্তী রাজা মনোনীত করতে হবে। এর প্রত্যুত্তরে রাজা দুষ্যন্ত বললেন—

"পরিগ্রহবহুত্বেহপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম"।।[৫]

এখানে ক্লাসিক্যাল বর্ণনার বিলাসিতা নেই ঠিকই, তবে যুগ যুগ প্রচলিত রূপকথা তথা গল্পগাথার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মানব দেহের বিশেষ অঙ্গের স্পন্দন, বিশেষ বিশেষ বিষয় অবলোকন প্রভৃতি ভবিষ্যৎ শুভাশুভের জ্ঞাপক-এই লোকবিশ্বাসের অনেক নমুনা এই নাটকে দেখা যায়। কণ্বাশ্রমে রাজা দুষ্যন্ত প্রবেশ করেছেন, ঠিক তখনই রাজার দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দন। দুষ্যন্ত বললেন এটা কি করে সম্ভব? তপোবনাশ্রমে বরস্ত্রীলাভ কী করে সম্ভব?

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহু কুতঃ ফলমিহাস্য,
অথবা ভবিত্যব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র"।।[৬]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে রাজা দুষ্যন্ত তো বললেন 'সম্ভাবনা নেই', তাহলে বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে? কিন্তু এটা নয়। এখানে রাজা দুষ্যন্ত সন্দেহ

প্রকাশ করেছেন যে এই তপোবন আশ্রমে সুন্দরী আসবে কোথা থেকে? স্থান বিষয়ে সন্দেহ, দক্ষিণবাহু স্পন্দনে সুন্দরী স্ত্রী লাভ হবে কি হবে না-এই বিষয়ে নয়, লোকবিশ্বাস, লোকাচার দৃঢ়মূল সংস্কার এ সবের জন্ম দেয়।

পঞ্চমাংকে শকুন্তলার—''অহো, কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি?''[৭] অর্থাৎ আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন? এই বলে অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হচ্ছে। আবার সপ্তমাংকে রাজার দক্ষিণবাহু স্পন্দনে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রত্যাশা পোষণ করলেও তিনি তা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না—

''মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা,
পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ততে''।।[৮]

কালিদাস এই সকল নিমিত্তকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলে পরিণত করেছেন। এজন্যই এই নাটকে লোকবিশ্বাসের বর্ণনাই নয়, তার অংশীদার স্বয়ং কবি—তারও প্রমাণ মিলছে।

রাজার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হল অথচ শকুন্তলা মিলল না। আবার শকুন্তলার ডান চোখ স্পন্দিত হল—অথচ রাজা শকুন্তলাকে সাদরে গ্রহণ করলেন, এমনটা ঘটলে লোক-সংস্কারের অস্তিত্ব প্রমাণ হলেও দৃঢ়মূল হতো না। এই সবকিছুকেই সবার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কবি লোকসংস্কারকে কার্যকারণ সম্পর্কে রূপায়িত করেছেন। ক্লাসিক্যাল সাহিত্য এইভাবে বহু ক্ষেত্রে লোকবিশ্বাসকে বা লোকসংস্কারকে সর্বকালীন সার্বজনীন করে তুলেছেন। কবিরা লোকাচারকে আশ্রয় করেন, আবার লোক-সংস্কার আশ্রয় নেয় কবির কাব্যে। এ যেন পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। পুত্র যেমন বাল্যকালে পিতার কোলে আশ্রয় নেয় ঠিক তেমনি পিতার বার্ধক্যে সেই পুত্র পিতার আশ্রয় হয়।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে আমরা দেখতে পাই, বৃক্ষলতাগুলির নামকরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে লোকসংস্কৃতির ছাপ। নবমল্লিকা লতার নাম রাখা হয়েছে 'বনজ্যোৎস্না'! আবার কোন এক সহকার তরুকে লতায় বেষ্টিত অবস্থায় দেখে এবং শকুন্তলাকে তার দিকে বারবার তাকাতে দেখে সখীদ্বয়ের মন্তব্য শকুন্তলা বনজোৎস্নার মতো সুন্দর বর চায়—''যথা বনজ্যোৎস্না অনুরূপেন পাদপেন সংগতা, অপি নাম এব অহমপি আত্মনঃ অনুরূপং বরং লভেয় ইতি''।[৯]—এগুলি অবশ্যই তরুলতার সঙ্গে মানুষের আত্যন্তিক ঘনিষ্টতার পরিচায়ক (যা লোক কালচার)। প্রথমাংকেই দেখেছি প্রিয়ংবদা সখী শকুন্তলাকে বলছে—''হলা শকুন্তলে, অত্রএব তাবৎ মুহূর্তকং তিষ্ঠ। যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া লতা সনাথ ইব অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ

প্রতিভাতি"।[১০] এই বক্তব্যের দ্বারা অতীতে যে বৃক্ষের সাথে মেয়ের বিবাহ হত, তাঁর স্মৃতি ভেসে উঠলো।

রাজা দুষ্যন্তকে পতি হিসেবে পেতে চায় শকুন্তলা—এই কথাটি রাজা দুষ্যন্তকে জানাতে হবে। কিভাবে অবগত করা যায়? সখীদ্বয় বুদ্ধি দিল যে, শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে একখানা প্রেমপত্র লিখে দিলে তারা তা দেবতার প্রসাদের ছলে রাজার হাতে পৌঁছে দেবে---"হলা, মদন-লেখো অস্য ক্রিয়তাম। ইমং দেবপ্রসাদস্যাপদেশেন সুমনো গোপিতং কৃত্বা তস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি"।[১১] এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। এই রকম উদাহরণ আরো অনেক আছে। প্রেমপত্র গোপনীয় ভাবে পাঠানোর কায়দাতেও লোক কাহিনীর ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

ভূত-প্রেত রাক্ষসের উপদ্রব বারবার এসেছে এই নাটকে। ঐ সকল কাহিনী লোকসংস্কৃতির, লোকবিশ্বাসের অন্যতম পরিচয় বহন করে। তৃতীয়ংকের শেষে আকাশবাণীতে ধ্বনিত হচ্ছে—

"সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে
বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ।
ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ
সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্"।[১২]

অর্থাৎ হে রাজা, সন্ধ্যাকালে যজ্ঞাক্রিয়া আরম্ভ হতেই প্রজ্বলিত অগ্নি সমন্বিত যজ্ঞবেদির চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ভীতি সৃষ্টিকারী সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ মাংসভক্ষণকারী রাক্ষসদের ছায়া চারদিকে বিচরণ করছে। ক্লাসিক্যাল নাটকে প্রবেশ করলো ওই রাক্ষসের কাহিনী। যজ্ঞে রাক্ষসের উপদ্রবের কথা শোনা মাত্রই রাজা দুষ্যন্ত ধনু হাতে তাদের হত্যা করতে ছুটলেন। এ যেন রঙে-ঢঙে, গন্ধে-বর্ণে রূপকথা আর রূপকথা।

রাজা দুষ্যন্ত পুত্রহীন হওয়ায় বংশলোপ পাবে। তার মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের অন্ন কে দেবে—একথা ভেবে তিনি চিন্তায় ব্যাকুল। কেননা, তার দেওয়া পিণ্ডজল পূর্বপুরুষেরা গ্রহণ করার আগে ভবিষ্যতে আর পিণ্ডজল পাবেন না ভেবে দুঃখে পিণ্ডজল দিয়েই নিজেদের অশ্রু ধৌত করে অবশিষ্ট জল পান করেছেন—

"অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি
কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি।
নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং

ধৌতাশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি"।[১৩]

এ ব্যাপারে রাজার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি জ্ঞান পর্যন্ত হারালেন। শকুন্তলার জন্য তিনি অনেক কেঁদেছেন কিন্তু কখনো সংজ্ঞা হারাননি। অথচ সংজ্ঞা হারালেন শকুন্তলার দুঃখে নয়, পিণ্ড লোপের ভয়ে। এছাড়াও বিদূষক মাধব্যকে আক্রমণ করে রাজাকে জাগ্রত করার চেষ্টা অথবা অদৃশ্যভাবে সানুমতীর রাজাকে অনুসরণ করার বর্ণনায় লোকগাথার পরিচয় মিলে। সপ্তমাংকে রথে চড়ে স্বর্গ থেকে আকাশ পথে ফেরার যে সুন্দর বর্ণনা—এতে রূপকথার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

'অভিজ্ঞান' শব্দের অর্থ হল স্মারক, অভিশাপের অবসান হবে স্মারক দেখালে এমন কথা ঋষি দুর্বাসা বলেন নি। তিনি বলেছেন 'অভিজ্ঞান-আভরণ' দেখালে রাজার স্মৃতি উদিত হবে—''অভিজ্ঞানাভরণ-দর্শনেন শাপো নিবর্ত্তিষ্যতি"।[১৪] রাজদরবারে রাজার কাছে যখন এলেন শকুন্তলা, তখন স্বয়ং তিনিই অভিজ্ঞান। কারণ, তার প্রতিটি পদক্ষেপ রাজা দুষ্যন্তের পরিচিত। পদচিহ্নকুশলী দুষ্যন্ত স্বয়ং শকুন্তলাকে দেখেও চিনতে পারলেন না, এছাড়াও মালিনী নদীর তটে নির্জন নিভৃত বেতস কুঞ্জের গোপন প্রণয়ের সুখ স্মৃতি জড়ানো ঘটনার বর্ণনাতেও তাঁর স্মৃতি জাগরিত হবে না—শুধুমাত্র অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখেই রাজা দুষ্যন্তের স্মৃতি ফিরবে—এই কাহিনীটি সত্যিই একটি রূপকথার গল্প ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আমরা আরো দেখতে পাই যে, অঙ্গুরীয়টি ছিল শকুন্তলার হাতে, শচীতীর্থে স্নান করে গিয়ে অঙ্গুরীয়টি জলে পড়ে গেল, তারপর সেই অঙ্গুরীয়টিকে আহার ভেবে একটা রুই মাছ খেয়ে নিল। ধীবর শচীতীর্থে মাছ ধরতে এল এবং ধীবরের জালে সেই রুই মাছটি ধরা পড়ল, এরপর ধীবর মাছটিকে বাজারে নিয়ে গেল, ধীবর বিক্রি করার জন্য রুইমাছটিকে কাটলো, কাটার পর মাছটির পেট থেকে সেই আংটিটি বেরিয়ে এল, সেই সোনার অঙ্গুরীয়টি বাজারে সোনারীর নিকট বিক্রয়ের জন্য গেল, সোনারী দ্রুততার সঙ্গে রাজরক্ষীকে খবর দিল, রাজরক্ষীরা ধীবরকে ধরে নিয়ে গেল রাজা দুষ্যন্তের কাছে। রাজা অঙ্গুরীয়টি দেখেই চিনতে পারলেন। অতএব, বহু অনিশ্চয়তার বাঁধা পেরিয়ে শেষপর্যন্ত আংটিটি রাজার হাতে পৌঁছালো—এটি রূপকথার গল্পেই সম্ভব। এখানে যুক্তিনিষ্ঠ হলে নাট্যরসে বঞ্চিত হতে হবে। যেটা হওয়ার কথা ছিল—শচীতীর্থে শকুন্তলার হাত থেকে অঙ্গুরীয়টি পড়ল, পাঁকের উপর কিছুক্ষণ পড়ে রইল। তারপর অঙ্গুরীয়টি পাঁকের গভীরে প্রবেশ করল। শকুন্তলার দুষ্যন্তকে পাওয়ার আশা শেষ বা দুষ্যন্তের শকুন্তলাকে

পাওয়ার আশা এখানেই শেষ।

ঠিক আছে, শকুন্তলা শচীতীর্থে স্নান করতে গিয়ে জলে আংটিটি পড়ল, একটি রুইমাছ অঙ্গুরীয়টিকে খেল, রুই মাছটি ধীবরের জালে ধরা পড়বে, ঘরে ফিরে ধীবর মাছটাকে কেটে (বাজারে অথবা বাড়িতে) অঙ্গুরীয়টি পেয়ে জেলে প্রথমে তার স্ত্রীর কথাটাই ভাববে। যাক তাও হল না। দরিদ্র হওয়ার কারণে না হয় ধীবরকে আংটিটি বিক্রি করতে হবে। গহনা দেখলে নারীরা জীবন থাকতে সেই গহনা ছাড়বেনা এজন্য হয়তো স্ত্রীকে আংটিটি দেখানো প্রয়োজন বোধ করেননি। ধীবর আংটিটি বেঁচতে গেল সোনারীর কাছে, সোনারী সহজেই বুঝতে পারলেন যে আংটিটি ধীবরের নয়। তাই সোনারী ধীবরকে ভয় দেখিয়ে কম টাকায় আংটিটি কিনবে এবং ধরা পড়ার ভয়ে সোনারী ঐ আংটিটি আগুনে গলিয়ে নেবে। দোকানদার তা করল না। এই রকম সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ব্যবসায়ী কোন যুগেই ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষ করে সোনা ব্যবসায়ী তথা সোনারীদের সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, তার মাও যদি সোনার গহনা করতে দেয়, সেই সোনাতেও সোনারী খাদ মেশাবে এবং ওজনে কম দেবে। ধরে নিচ্ছি সোনারী ছিল সোনার চরিত্র, কিন্তু রাজরক্ষীরা সেই আংটিটি গায়েব করে দেবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ, দশমিনিট আগে যে ধীবরকে আংটিটি চুরির দায়ে শারীরিক অত্যাচার করছিল, তারাই আবার ধীবরের সঙ্গে মদ্যপান করে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে লজ্জা করছে না—তাদের সম্পর্কে এমন ভাবটাই স্বাভাবিক।

মূল বিয়য হল—রাজা দুষ্যন্তের হাতে আংটিটি আসাটা সম্পূর্ণ গল্পগাথার প্রবহমান ধারা থেকে আগত। জেলের কাছ থেকে রাজা আংটিটা দেখা মাত্রই, শকুন্তলাকে মনে পড়ার ব্যাপারটা দর্পণে সময়কে পিছিয়ে নিয়ে চম্ভ্রন্তক্ষথত্বদ্ধ-এ অতীতের দৃশ্য দেখার সঙ্গেই মেলে। লোকবিশ্বাস মনের গভীরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে লেখক-পাঠক-দর্শক কারোর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হত না, পুরো গল্পটাই রূপকথা বলে মনে হত, নাটকে পরিণত হত না।

যুদ্ধে জয়লাভ করে দুষ্যন্ত স্বর্গ থেকে স্বর্গীয় বিমানে মর্ত্যে ফেরার পথে মারীচ মুনির আশ্রমে নামলেন, সেই সময়েই সর্বদমনের সিংহশিশুর সাথে খেলা, সর্বদমনকে রাজার দর্শন, সর্বদমনের 'শকুন্ত' তথা মাটির ময়ূর চাওয়া—এই সকল কিছুই পরিকল্পিত অনিশ্চয়তার সমাহার। সর্বদমন তথা ভরতের জন্মের সময় মারীচ মুনি ভরতের হাতে অপরাজিতা নামক রক্ষা কবচটি পরিয়ে দেন তাকে রক্ষা করার জন্য। এই কবচটি কোনো কারণে মাটিতে পড়লে তার পিতা-মাতা বা নিজে ছাড়া

অন্য কেউ মাটি থেকে তুললে সেই কবচটি সাপ হয়ে সেই ব্যক্তিকে দংশন করবে—

''মহারাজ:। এষা অপরাজিতা নাম ঔষধিঃ অস্য জাতকর্ম বিষয়ে ভগবতা মারীচেন দত্তা। এতাং কিল মাতাপিতরৌ আত্মানং চ বর্জয়িত্বা অপরঃ ভূমিপতিতাং ন গৃহ্নাতি, রাজা-অথ গৃহ্নাতি প্রথমা-ততঃ তং সর্পঃ ভূত্বা দশতি''।[১৫] এই বিষয়টাও লোক বিশ্বাসের অন্তর্গত।

সংকেত-সূচী :

১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-প্রথমাংক, পৃ:৩০
২। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-প্রথমাংক, পৃ:৩৩
৩। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-১/১২
৪। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-প্রথমাংক, ৩/১৩
৫। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্- ৩/১৭
৬। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-১/১৫
৭। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-পঞ্চমাংক, পৃ:৩৬৫
৮। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্- ৭/১৩
৯। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-প্রথমাংক, পৃ:৫৫
১০। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-প্রথমাংক, পৃ:৫২
১১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-তৃতীয়াংক, ২০৬
১২। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্- ৩/২৫
১৩। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-তৃতীয়াংক, ৬/২৫
১৪। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-চতুর্থাংক, পৃ: ২৬১
১৫। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-সপ্তমাংক, পৃ: ৫৭২

সহায়ক-গ্রন্থসূচী :

১। কালিদাস-অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ড. অনিলচন্দ্র বসু (সম্পা), সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা ২০০৩।

২। কালিদাস-অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা-১৯৮৮।

৩। কালিদাস-অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ড. সুধাকর মালবীয় (ব্যাখ্যাকার), চৌখম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমি, বারানসী-২০০২।

৪। কালিদাস-অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শিবপ্রসাদ দ্বিবেদী (ব্যাখ্যাকার), ভারতীয়

বিদ্যা প্রকাশন, দিল্লী-২০০০।

৫। কালিদাস-অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, নির্মাল্য দাস (সম্পা), দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কোলকাতা-২০১২।